মা ও মেয়ে, মেয়ে ও মা

রোকেয়া আহমেদ

মা শব্দটি কত গভীর মায়া মমতায় ভরা, মায়ের ঘোমটা জড়ানো শান্ত মুখের মতই তা কোমল। সার্বজনীন এই ডাকটি কে ঘিরে সবার কত স্মৃতি, আনন্দ আহ্লাদ, সুখ দুখের গল্প থাকে, পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র আর মহান আবেগের উৎস আর কেন্দ্র হলেন মা।

মায়ের ভালোবাসা পাওয়ার আকুলতা, মাতৃ সঙ্গ পাবার তৃষ্ণা কি প্রয়োজন নির্ভর বা বয়স সাপেক্ষ নয়? এটি কি এক চিরন্তন অর্বাচীন ব্যাকুলতা যা মানুষ আমৃত্যু লালন করে যায়? শৈশব, কৈশোর এর অপরিণত, হাজারো প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের সময়ে মাকে বড় বেশি লাগে, সেই নির্ভরতার একটি বাস্তব ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু পরিণত বয়সেও কি মায়ের জন্য এক অযৌক্তিক নির্ভরতা, আকুল তৃষ্ণা রয়ে যায়না? পরিণত বয়সেও মাকে কাছে পাবার আনন্দ বা না পাওয়ার বেদনা কেমন হতে পারে তা আমি আমার বাবা মাকে দেখে যেমন বুঝেছি, তেমনি নিজের জীবনে বয়ে বেড়ানো শূন্যতা থেকেও টের পাই।

ছোটবেলায় মা কে যখন ঘরকন্নায় ব্যস্ত, আমাদের যত্ন আত্তি করা একজন মা হিসেবে দেখতাম তখন সেটাকেই খুব স্বাভাবিক মনে হত, কারন তিনি তো শুধু আমাদের মা, তার আর কোন ভূমিকা বা পরিচয় বা সম্পর্ক আছে তা কখনো মনেই হয়নি। শুধু বছর শেষে একটা সময় দেখতাম মা আগের চেয়ে ও ঘর গোছগাছ, নানারকম রান্না বান্না নিয়ে মহা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, তিনি তখন শুধু আমাদের মা নন , অপার্থিব কোন আনন্দে তিনি বালিকা মেয়ের মতই ছটফটে, চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। আমরা বুঝে যেতাম নানা নানু আসছেন আমাদের বাসায় বেড়াতে প্রতি বছরের মত। নানা নানু আসার পরে যে কদিন থাকতেন আমাদের বাড়িটা হাসি আনন্দ, অতিথি সমাগমে, আড্ডায় আর মায়ের হাতের মজার সব খাওয়ায় জম জমাট হয়ে থাকতো।

আর আব্বাকেও দেখতাম আম্মার মতই মহাখুশি। আমরা দাদিকে পাইনি, আব্বার বিয়ের পরেই তিনি মারা যান। ছোটবেলা থেকেই দেখতাম আব্বা তাঁর মায়ের গল্প বলতে খুব ভাল বাসতেন। নিজের মায়ের রান্নার কুশলী সমকক্ষ তিনি আর কাউকে পান নি, এমন কি আমার আম্মার অত বিখ্যাত অনেক রান্নাও দাদির ধারে কাছে ঘেঁসতে পারতনা । আব্বা যখন দাদির হাতের মজার কোন রান্না, তার ঘরকন্নার নিপুণতা, বা তাঁর আদর শাসনের গল্প করতেন, তখন আব্বার মুখ কখনো আনন্দজ্জল, কখনো বেদনাবিধুর হয়ে উঠত। নিজের মাকে বেশিদিন পান নি বলেই হয়ত শাশুড়ি মানে আমার নানুকে নিজের মায়ের মতই শ্রদ্ধা ভক্তি আর আদর যত্ন করতেন। নানা নানুর প্রিয় সব খাবারের বাজার নিজের হাতে করতেন, তাঁদের আরাম আয়েশ, ওষুধ পত্তর এর প্রতি তার ছিল কড়া নজর। নানা নানু আসার পরে আমাদের সবার খুশির মাঝে সবচেয়ে উদ্ভাসিত হয়ে থাকত দুই মা মেয়ের খুশি- মাকে পেয়ে আমার আম্মার আনন্দ ঝলমলে মুখ আর মেয়েকে কাছে পেয়ে নানুর প্রশান্ত হাসি ভরা মুখ।

কিন্তু কয়েকদিন পরেই এই চিত্রটি পালটে যেতে থাকত, নানা নানুর চলে যাবার দিন যতই এগিয়ে আসত, আম্মার মুখে ততই আসন্ন বিচ্ছেদের শ্রাবণ ঘনিয়ে উঠত। তারপর নানুর চলে যাওয়ার দিন

আম্মা আবার একটা ছোট্ট অবুঝ মেয়ে হয়ে যেতেন, তার আর নানুর অঝোর কান্না দেখে বালিকা আমিও বড় অবাক হয়ে যেতাম আর ছলছলে চোখে ভাবতাম, মায়েরা ও তাহলে তাদের মায়েদের জন্য কাঁদে? মা' রা বড় হয়ে যাওয়ার পরেও তাদেরও মাকে প্রয়োজন হয়? এখন এই বয়সে পৌঁছে নিজের জীবন অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছি মায়েদের ও নিরন্তর মা লাগে, চিরকালীন এই প্রয়োজন; এই জীবন যুদ্ধের রুক্ষ দীর্ণ প্রান্তরে মা -ই ত আমাদের ছায়াবৃক্ষ, আমাদের 'বিষাদের অভয়ারণ্য'। মায়েরা দূর আকাশের তারা হয়ে গেলে এই মাটির পৃথিবীতে তাদের আরো বেশি মনে পড়ে, বেশি করে তাদের প্রয়োজন হয়।

মাকে নিয়ে আমার কাটান সতেরটি বছরের যে জীবনালেখ্য তাতে তাকে অন্য সব মায়ের মতই দেখেছি, পেয়েছি। যেমন করে কবি শামসুর রাহমান দেখেছেন তার মাকেঃ

"মাকে দেখি প্রতিদিন ধ্যানী প্রদক্ষিনে
ছায়াবৃত আপন সংসারে। তাকে চিনে
নিতে পারি সহজেই যখন নিভৃত অনুভবে বারবার
একটি ভাস্বর নদী, ফুলের বাগান, মাঠ আর
শস্যক্ষেত, দুরের পাহাড়
গলে গিয়ে একই স্রোতে বয়ে যায়, সীমা
মুছে যায় চরাচরে; স্বদেশের স্বতন্ত্র মহিমা অনন্য উপমা তার.....
...মাকে দেখি। আজো দেখি কি এক মায়ায়
পাখি তার হাত থেকে স্নেহের খাবার খেয়ে যায়
দুবেলা আবেগ ভরে। দেখি তসবী গুনে
সন্ধ্যার মিনারে
সত্তার কিনারে
ঐ দূরায়নী আজানের ধ্বনি শুনে
আর সুবে- সাদেকের তীব্র শুভ্রতায় নির্মেঘ আনন্দ শোকে
আজীবন সমর্পিতা কোরানের শ্লোকে।"

এত আগে সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে চলে গেলেন বলে মায়ের উপর অনেক অভিমান হত অনেক বছর , তাঁকে বড় বেশি স্বার্থপর মনে হত। এখন জীবনের এই পর্যায়ে এসে বুঝে গেছি অত তাড়াতাড়ি যাওয়াটাই ছিল তাঁর নিয়তি আর আমাদের অপারগতা । স্বার্থপর তিনি কোন দিনই ছিলেন না, নিঃশেষে নিজেকে সবার জন্য বিলিয়ে দেওয়াই ত ছিল তার জীবনের মূলমন্ত্র। আমাদের পিঠাপিঠি পাঁচ ভাই বোন কে মানুষ করার অত কঠিন, শ্রমসাধ্য আর

সময়সাপেক্ষ কাজ সামলেও তিনি তার প্রাণশক্তি কে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আরো অনেক পারিবারিক সামাজিক কাজে। আত্মীয় পরিজনের সেবা, পাড়া প্রতিবেশীর খোঁজ খবর নেয়া, বিপদে আপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানো – কি অফুরান ছিল তাঁর প্রাণপ্রাচুর্য, দায়িত্ব বোধ, কর্তব্য নিষ্ঠা। হাসিখুশি, সংবেদনশীল নরম শরম এই মানুষটার আর একটি অসাধারণ গুনের কথা জানা গেল তার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে; সেটি হল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করার অপরিসীম সাহস ও ধৈর্য শক্তি। মরণ ব্যাধি ক্যান্সার থার্ড স্টেজে ধরা পড়ার পরেও তিনি ছিলেন শান্ত, স্থিতধী, কোমল করুন হাসিতে ভরা, সৃষ্টিকর্তার উপর নির্ভর করা এক সাহসী সংশপ্তক। কোন অভিযোগ, অনুযোগ নেই, ব্যাথার তীব্রতা তেও নেই কোন সরব প্রতিক্রিয়া, নীরবে নিঃশব্দে তিনি তার অনিবার্য নিয়তিকে মেনে নিয়েছিলেন। অপারেশন আর রেডিও থেরাপির পরে ডাক্তার তাঁর তিন মাস আয়ু বেধে দিয়েছিলেন। এই তিন মাস আমাদের জন্য কি দ্রুত বয়ে গেলো,

কিন্তু তার জন্য তো সেটা ছিল হাতের আঁজলা গড়িয়ে পড়ে যাওয়া জীবনের শেষ কটি দিন, রাত আর মুহূর্ত। ক্যান্সার যন্ত্রণার চেয়েও যে প্রবল বেদনা তাকে সজল করে তুলত তা ছিল পাঁচটি ছেলেমেয়ের কি হবে সেই অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ভাবনা, বিশেষ করে আদরের ছোট তিন বছরের দুরন্ত ছেলেটার জন্য হাহাকার তাকে মাঝে মাঝে অশ্রুময় করে তুলত। শেষের দিন গুলোতে আর সেটি নিয়েও ভাবতেন না, দিন রাত্রির প্রবল যন্ত্রণা তে নিঃশব্দ অভিযোগহীনতায় তিনি অনাগত মৃত্যুর জন্য মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তারপর আর কি- তাকে তো যেতেই হল, সব ছেড়ে, মায়াভরা সংসার, বাবা মা, স্বামী সন্তান এবং তিন বছরের ছোট্ট ছেলেটার স্নেহের আঙ্গুল ছাড়িয়ে; মৃত্যুর ওপারে। ক্যান্সারের সাথে লড়াই করার তার এই অবিচল ধৈর্য আর মনোবল, মৃত্যু কে বরন করে নেয়ার তার এই অপরিসীম সাহসকে আমি প্রণতি জানাই।

এই প্রসঙ্গে মাকে নিয়ে লেখা শামসুর রাহমানের আরেকটি প্রিয় কবিতার কথা মনে পড়লঃ

মার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে

“কি করে যে তোমায় শুইয়ে দিতে পেরেছি এখানে
শীতল মাটির নিচে? মা, তুমি নিথর নিদ্রা মুড়ি
দিয়ে আছো, ফাল্গুনের রোদ
বিছানো কাফন ঢাকা শরীরে, তোমার
উন্মোচিত মুখ স্পর্শ করি শেষবারের মতন।
বজ্রের আওয়াজ কর্জ করে
যদি ডাকি বারবার, তবু তোমার এই ঘুম
ভাঙবে না কোনওদিন, কোনওদিন আর...
.....মা তোমার শিয়রে গোলাপ রেখে হৃদয়ে সায়াহ্ন
নিয়ে পথ হাঁটি, প্রাণে ঝরে মরা পাতা,
মৃদু হাওয়া বন্দিনীর শীতল ফোঁপানি,
চোখ বড় বেশি জ্বালা করে।”

আম্মার এই লড়াইয়ে তার একজন একনিষ্ঠ সহযোদ্ধা আর সহমর্মী ছিলেন ; তিনি হলেন তাঁর মা মানে আমার নানু। সবার উৎকণ্ঠা, অসহায়তার মাঝে তিনি নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে আম্মার সমস্ত সেবা শশ্রুষা, যত্ন করেছেন, আম্মা আবার তাঁর কোলের ছোট্ট আদরের মেয়েটি হয়ে উঠেছিলেন। কত রাতের পর রাত আম্মার মাথার পাশে বসে কোরআন পাঠ আর নামাজের আকুল প্রার্থনার মাঝে নানু শুধু আম্মার রোগমুক্তি আর দীর্ঘআয়ু কামনা করতেন। কিন্তু তিনি কখনো দুর্বল হয়ে বা ভেঙ্গে পড়েন নি, হতাশার কথা কখনো উচ্চারণ না করে ঋজু কণ্ঠে আল্লাহর উপর ভরসা রাখার কথা বলতেন। আম্মার মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে তিনি আর রোগমুক্তির দোয়া করতেন না, বরং আম্মার কষ্টের দ্রুত অবসান আর শান্তিময় মৃত্যুর জন্য দোয়া করতেন। কতটা সাহসী, দৃঢ় চিত্ত আর নির্ভীক যোদ্ধা হলে মৃত্যুর সাথে এমন অসম যুদ্ধ করতে পারে মানুষ? আজ মনে হয় শুধু হয়ত মায়েদের ই আল্লাহ সেই মমতার শক্তি, ত্যাগের মহান নিঃস্বার্থতা আর সত্যকে গ্রহণ করার বলিষ্ঠ সাহস দিয়েছেন, যা দিয়ে সন্তানের মঙ্গলের জন্য তারা জীবনের সমস্ত গরল কে হাসিমুখে অমৃতের মত করে বইতে পারেন।

সেদিন ফেসবুকে একটি লিঙ্ক দেখে অনেকদিন পর আমার আম্মা আর নানুদের মত অগণিত মায়েদের এই সাহস আর মমতাময় শক্তির কথা মনে পড়ল। লিঙ্কটিতে পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন চাকরির একটা মক ইন্টার্ভিউ দেখাচ্ছিল যে জবের কোন পেমেন্ট নেই, ২৪/৭ এর এই চাকরিতে

নেই কোন ছুটিছাটা, প্রমোশন অথবা স্বীকৃতি, অথচ তাতে প্রয়োজন হয় ইন্টার পারসোনাল কম্যুনিকেশন স্কিল, ফাইনান্স এর জ্ঞান, সহ আর অনেক গুণাবলির। চাকুরী প্রার্থীদের বিস্ময় আর অবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে পরে বলা হল এই অ্যাবসার্ড কঠিন চাকরিটি আসলে হল মায়ের কাজ, সন্তানের লালন পালনের জন্য যা সারা বিশ্ব জুড়ে অগণিত মায়েরা করে যাচ্ছেন নিরন্তর। নিজেকেও সেই বিলিয়ন মায়েদের একজন জেনে বড় গর্ব বোধ করছি, এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তোলায় অন্য সব মায়েদের মত আমার ও যৎসামান্য কিছু ভূমিকা আছে ভেবে ভাল লাগছে। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিশ্ব ব্যাপী আনুষ্ঠানিক ভাবে পালিত Mothers Day উপলক্ষ্যে সব মায়েদের আমাদের সশ্রদ্ধ শুভকামনা জানাচ্ছি। যারা এখনো এই পৃথিবীতে সন্তানদের আগলে আছেন তাঁদের সবার মনোবাসনা পূর্ণ হোক, দীর্ঘজীবী হন তাঁরা, সুস্থ থাকুন, আনন্দময় হোক তাঁদের জীবন।আর যেসব মায়েরা চলে গেছেন, তাদের জন্য মাগফিরাত আর জান্নাত কামনা করছি, রাব্বির হাম হুমা কামা রাবি ইয়ানি সাগিরা।